ডোমেদের জীবন কথা

অরিজিৎ দাসঅধিকারী

উৎস ধারা

'নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়ি আ।
ছোই ছোই জাহি সো ব্রাহ্মণ নাড়ি আ।।'
অনুবাদে—
'ওরে ডোম্বী, নগর বাহিরে তোর কুঁড়ে।
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় যা তা' বামুন ও নেড়ে।।'

দশম চর্যাপদে এই চর্যা রচনা করেছেন বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম তথা চর্যা পদকর্তা কাহ্নপাদ। এখানে নড়ি আ অর্থে নেড়া ব্রাহ্মণচারী বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বোঝানো হয়েছে।

ডোমেদের চণ্ডাল বলে ডাকা হয়। এরা বাংলা-বিহার সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থান করছেন। এদের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত। তবে ড. কলড উইল (DR. CALDWELL) এর মতে 'Dome and other chandals of Northern India and the Pareiyas and other low tribes of the Peninsula.' অনেকের মতে এরা পর্বত গুহাতে বাস করা ভালো দ্রাভিডিয়ান (Dravidian) কুলি জাতীয় থেকে সৃষ্ট। আবার মি. আটকিনসন (MR. ATKINSON)-এর মতে দাসেদের থেকে ডোমেদের সৃষ্টি। দাসেদের মতো ডোমেদেরও দ্রব্য কেনাবেচনার ন্যায় বেচাকেনা হত। স্যার হেনরি ইলিয়ট (SIR HENRY ELLIOT)-এর মতে—'Seem to be one of the aboriginal tribes of India.' প্রাচীন দুর্গে এদের অবস্থান ছিল। ডোম দুর্গ যেমন দমন গড়, রামগড়, রোহিনীর সাঁইকোটেও বর্তমান। মি. কার্নোগিরি মনে করেন রাজপুতদের অবক্ষয়ী জাতি হল ডোম।

উদ জেলার রামলাবাদে আলিবাম ডোম রাজ্যপাল হিসাবে উচ্চপদে আসীন হন। তিনি রাজার এমন উচ্চপদ প্রাপ্তিতে অনেক মানুষকে চাকরি দিতে সমর্থ হন।

বাহ্যিক গঠন

ডোমেদের ব্যক্তিগত বাহ্যিক চরিত্র বিশ্লেষণে অনেকে মনে করেন ডোমেরা বাইরে থেকে এসে থেকে যান (aboringis)। মাঘাইয়া ডোমেরা অনার্য জাতির ন্যায় বেঁটে, কালো, ঝাঁকড়া চুল, উজ্জ্বলতম চোখ যুক্ত হন। মি. মেরিং বলেন তাদের নিম্ন আচরণের জন্যই ডোমরা অন্য জাতির থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এরা অনার্য মিশ্র জাতির হন।

অভ্যন্তরীণ গঠন

ডোমেরা বিশাল জনজাতি ও ব্যাপক এলাকা বিস্তৃত। এই জাতির অভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্র

স্থানে স্থানে গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে ভিন্ন। সে কারণে উদ্ধার কষ্ট সাধ্য। যা পেলাম তা এইরূপ :

মাসাইয়া ডোমেদের সম্পর্কে এক গল্প শোনা যায়। কৈলাসাধিপতি মহাদেব ও দেবী পার্বতী একবার সকল জাতিকে ভোজনসভায় আহ্বান জানান। এতে সকল জাতির পূর্বপুরুষরা যথাসময়ে আসেন ও ভোজসভায় অংশ নেন। ভোজন সারতে থাকেন। ডোমেদের পূর্বপুরুষ সুপাট ভকত বেশ দেরিতে আসেন। তিনি ক্লান্তিসহ অন্যান্য কারণে বেশ ক্ষুধার্ত ছিলেন। এসেই তিনি অন্য জাতিদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করতে থাকেন। এই বিষয়ে মহাদেব ও দেবী পার্বতী তঁকে সহ তাঁর উত্তরপুরুষদের অধঃপতিত করেন। সেই সাথে অভিশাপ দেন যে চিরদিন এরা (ডোম) উচ্ছিষ্ট ভোজন করবে। যে কারণে এখনও এই জাতীয় ভিক্ষুক ডোমেদের জাতি জানতে চাইলে সে বলে 'আমি ঝুটা খাই' (Jhuta Khai)।

ভারতীয় ডোমেদের পূর্বপুরুষ ধরা হয় কুলুবীরকে। তিনি লেট ও বাগদি উপজাতির সঙ্গে চণ্ডাল রমণীর সন্তান। কুলুবীরের চার পুত্র। এরা হলেন প্রাণবীর (PRAN BIR); মন বীর (MAN BIR); ভান বীর (BHAN BIR) ও সান বীর (SHAN BIR) । এই চার সন্তানের থেকে ডোমেদের চারটি উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে। চারটি উপজাতি হল আনকুরিয়া (ANKURIA), বিশডোলিয়া (BISDELIA), বাজুনিয়া (BAJUNIA) ও মাগাইয়া (MAGAHIYA)।

এই উপজাতি প্রাপ্তির বিষয়ে মজাদার গল্প বর্তমান। একটি মন্দিরে বলি ও পুজোর জন্য প্রাণবীর ও মনবীরকে ফুল আনতে বলা হয়। দুই ভাই ফুল আনার নিমিত্ত বনে যান। প্রাণ বীর একটু অলস ছিলেন। তিনি আঁকশি দিয়ে ফুলকে টানতে থাকেন। সেই টানে ফুল গাছ থেকে মাটিতে পড়ল আর তা কুড়িয়ে পুজোর জন্য নিয়ে এলেন। যেহেতু আঁকশি দিয়ে ফুল পাড়েন ও মাটিতে পড়ে যাওয়া ফুল কুড়িয়ে পুজোর জন্য আনেন তাই তাঁকে সহ তাঁর উত্তরপুরুষদের নাম দেওয়া হল 'আঙ্কুরিয়া' উপজাতি। অপর দিকে মন বীর পুজোর ফুলের জন্য গাছে উঠে কষ্ট করে কুড়িটি ডালের থেকে ফুল পেড়ে আনেন। পুজোতে তারই ফুল ব্যবহৃত হয়। যেহেতু কুড়িটি ডাল থেকে তিনি ফুল আনেন তাই তাঁকে উপাধি দেওয়া হয় 'বিশ ডালিয়া' বিশ অর্থে কুড়ি বা দুই দশক। সেই থেকেই তাঁর উত্তরপুরুষদের উপজাতীয় নাম হয় 'বিশ ডালিয়া।' বড় ভাইয়ের এমন অধঃপতনে তৃতীয় ভাই ভানবীর নিজের স্থূলকায় উদরে ঢাকের মতো বাজিয়ে বাজিয়ে আনন্দ করতে থাকেন। পেট বাজানোর এমন ঘটনায় তাঁকে সহ তাঁর উপজাতীয় নাম দেওয়া হল বাজুনিয়া বা Musician Doms. এই ডোমের উপজাতিগণ বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ঢাক বাজাতেন। তবে বর্তমানে অন্যান্য নানান উপজাতি ও সম্প্রদায়ের জনগণও ঢাক বাজান। মুচিদের সাথে অনেকেই ডোমেদের একই ভাবেন।

তাপসপুরিয়া বা ডাকলদেশিয়া অনেকের মতে কুলুবীরের পুত্র বলে মনে করেন। একবার মহাদেব গঙ্গা থেকে জল আনার জন্য পাঠান তাপসপুরিয়াকে। তিনি আজ্ঞা পুরণে গঙ্গায় যান। কিন্তু নদীচরে দেখতে পান একটি মৃতদেহ দাহ করবার তোড়জোড় চলছে। মৃতের পরিবার তাঁকে দেখে অর্থের বিনিময়ে গর্ত খোঁড়ার কাজে সাহায্য করতে বলেন।

অর্থপ্রাপ্তির লোভে মহাদেবের কাজ সরিয়ে রেখে মাটি খুঁড়তে লেগে যান। অন্যদিকে মহাদেব দিব্য নয়নে সবই অবগত হন। তাঁর ভক্ত আজ্ঞা পালন অপেক্ষা অর্থের লোভে যেহেতু শবদাহতে অংশ নিয়েছে তাই তিনি অভিশাপ দিয়ে বলেন—'তুমি ও তোমার প্রজন্ম বংশপরম্পরায় মৃতদেহ সৎকারে নিযুক্ত থাকিবে।' যে কারণে এদের উপজাতীয় নাম মাগাইয়া।

মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ডোমেরা নানা ধরনের। এঁরা হলেন—মাহালি, ব্যসস্থ, কুমড়ি ও ওড়িয়া। বিভিন্ন উপজাতীয় জীবিকার ধারাও ভিন্ন ভিন্ন। সে বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

বিবাহ কথা

ডোমেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য গোত্র বিচারের ধারা লক্ষ করা যায়। একই গোত্রের পঞ্চম উত্তরপুরুষ পর্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ। জেনেটিক রোগ সংক্রমণ থেকে দূরে থাকবার দারুণ ব্যবস্থা। আমাদের বঙ্গে একই গোষ্ঠীর ডোম যুবকের সঙ্গে সেই গোষ্ঠীর মেয়েরা বিবাহ নিষিদ্ধ। বাঁকুড়াতে এই রীতি তিন পুরুষ পর্যন্ত মানা হয়। চব্বিশ পরগনায় স্বপিণ্ড অর্থাৎ একই বংশধারার পাত্র-পাত্রীর বিবাহ অবৈধ। এই রীতি উচ্চবর্ণের অনুকরণীয়। এই প্রথা ডোমেদের সাধারণত থাকে না।

কোনও উচ্চবর্ণের পুরুষ যদি ডোমেদের মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মিলিত হন; সেক্ষেত্রে যদি ওই উচ্চবর্ণের ব্যক্তিকে তার সমাজ বিতাড়িত করেন, তখন এক বিশষে রীতি মেনে ডোমরা ওই ব্যক্তিকে নিজ জাতিতে তুলেন। চর্যাপদে প্রথমেই সেই ঘটনার পদের উল্লেখ করেছি। এইক্ষেত্রে ব্যক্তিকে ন্যাড়া করে ডোমদের পঞ্চায়েতকে দক্ষিণা দিয়ে তাঁর হাতের ছিটানো জলে স্বজাতিভুক্তি হয়। সেই সাথে এরপর ওই দিন ভোজসভায় ব্যক্তিকে একসাথে ভোজে বসতে হয়। অন্য ডোমেদের সেবাও করতে হয়। দেখা গেছে নতুন সদস্য ডোমেদের মূল সদস্যদের সাথে পৃথক চোখে দেখা হয়। তবে ওই যুগলের মিলনের সন্তান মায়ের উপজাতিভূক্তি হয়ে জীবনধারণ করে ও পূর্ণ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়।

সন্তানের বিশেষত মেয়েদের কম বয়সে বিবাহ দেওয়া হয়। দশ বছরের বেশি বয়স পর্যন্ত বাবার বাড়িতে থাকা ডোম সমাজে অন্যায় মনে করা হয়। এক্ষেত্রে বিপরীত পণপ্রথা লক্ষ করা যায়। পাত্রের বাবাকে পাত্রীর বাবাকে পাঁচ-দশ টাকা প্রদান করে বিয়ের অনুমতি নেন। এই সমাজে বিয়ের পূর্বের মিলনে কোনও অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় না। তবে বাগদিদের ন্যায় বিবাহের পূর্বে গাছ বা প্রতীকের সাথে বিবাহরীতি নাই।

বিবাহের সময় প্রথমে দুপক্ষের অভিভাবকগণ স্থির করেন। অল্প ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দিন স্থিরের পরে পাত্র-কন্যার সাক্ষাৎ হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবাহ বাসরে সাক্ষাৎ হয়। বিবাহের সময় যদি দেরিতে হয় তবে উভয়পক্ষ শুভদিন ধার্য করে কাপড়, ধান-দূর্বা, মিষ্ট দ্রব্য, মালা-চন্দন, উপহার সহ শঙ্খধ্বনিতে সমাপন হয়। বিবাহের দিনে পাত্রের গায়ে

দেওয়া তেল হলুদের কিছু অংশ পাত্রীর বাড়িতে পাঠানো হয়। সেই তেল হলুদ পাত্রীর গায়ে দেওয়া হয়। বিবাহ বাসরে মাতুলরাই কন্যাকে বের করেন। বিবাহ দুদিন ব্যাপী হয়। কন্যাকে যদি পুরুষ সদস্য সম্প্রদান করেন তবে কন্যার ডান হাত; অপরপক্ষে বিপরীত অর্থাৎ স্ত্রী লোক সম্প্রদান করলে বাম হাত হস্তবন্ধনে বাড়ান। কন্যার হাতের বিপরীত হাত সহ পাত্রের সাথে হস্তবন্ধন হয়। শুভ দৃষ্টি, মালাবদল হিন্দুরীতি মেনে পালিত হয়। প্রথম বিবাহের ঘটকে সূর্যোদয়ের পূর্বে গোপনে পুকুরে পাত্র-পাত্রী ডোবাতে যান। ঘট পুকুরে ডোবানোর পরে এক ডুবে পুকুর থেকে পাত্রপাত্রী কিছু হাতে নিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। কে কি দ্রব্য হাতে পেল সেই নিয়ে আগামী জীবন (দাম্পত্য) কেমন যাবে সে বিচার চলতে থাকে।

দ্বিতীয় বিবাহে সাতটি বিশেষ ফুলের প্রয়োজন হয়। সেগুলো হল—ডালিম, রক্ত জবা, অপরাজিতা, গাঁদা, বেল, ধুতরা ও ম্যাদড়। এছাড়াও ৭টি হলুদ শুঁটি, ৭টি তুলা, ধারি-যব-আতপ চাল ও ধান প্রয়োজন হয়। আবার নতুন ঘটস্থাপন হয়। পাত্রপাত্রী নতুন পোশাকে বিয়েতে বসেন। দ্বিতীয় বিবাহে ষড়রিপুকে বশ করা হয়। সেই সাথে মেয়েদের ফুল ফোটার (সন্তান ধারনের নিমিত্ত) অঙ্গীকারবদ্ধ করা হয়। এই বিবাহে পাত্রীকে আগে তেল-হলুদ মাখানে হয়। সেই তেল-হলুদ নিয়ে পাত্রকে মাখানো হয়। এরপরে পাত্র শিলের উপর দাঁড়ান। পাত্রী তাকে শিল উলটে ফেলেছেন। মহামায়ার অংশ পাত্রীর শক্তি পরীক্ষা নেন পাত্রপক্ষের পরিবার। এই বিশেষ রীতি সামাজিক বিবাহে আজও লক্ষ করা হয়। বিবাহ (দ্বিতীয়) শেষে ঘটকে বাসর ঘরের ঈশানকোণে রাখা হয়। বিবাহের জন্য হলুদ সুতোতে দূর্বা বেঁধে পাত্র-কন্যার হাতে বাঁধা থাকে। ঘট বিসর্জনের সময় তা কেটে ঘটে দেওয়া হয়। এই রাতেই স্বামী ও স্ত্রীর প্রথম মিলন ঘটে। পরদিন স্নান সেরে কন্যা শ্বশুরবাড়ি রওনা হয়। এক্ষেত্রে বিবাহের তিন দিন পর অথবা তিন পক্ষ পরে রওনার রীতি বর্তমান। তিন পক্ষ হল যে পক্ষে বিবাহ হয় সেই পক্ষর বাকি দিনগুলো সহ আবার এক পক্ষ পরে আবার সেই পক্ষ এলে হয় তিন পক্ষ। শুক্ল পক্ষে বিবাহ হলে সাথে সাথে কন্যা নিজ গৃহে না রওনা হলে ওই পক্ষের বাকি দিন সহ কৃষ্ণ পক্ষ পুরোটাই পরে আবার শুক্লপক্ষ এলে সেই পক্ষের সুবিধাজনক দিনে কন্যা শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ নিজ বাড়ি রওনা হন। ধনী ডোমগণ বিবাহের মণ্ডপ, বাসর সাজান ও চাঁদোয়া ব্যবহার করেন।

বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহ ডোম সমাজে বৈধ। একজন ডোম পুরুষের কতজন স্ত্রী থাকবে তা তার আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর নির্ভর করে। তবে একজন পুরুষের একজন স্ত্রী কম হয়। দুই অথবা ততোধিক স্ত্রী বেশি লক্ষ করা যেত। বর্তমানে এই ধারা নিম্নগামী। বিবাহবিচ্ছেদের মাধ্যমে মেয়েরাও পুনঃবিবাহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রথম বিবাহের সেই স্মৃতিকে ভুলতে হয়। আদালতে তা অনুমোদন করাতে হয়। স্বামী বন্ধ্যা, অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতি হলে স্ত্রীরা বিবাহবিচ্ছেদ চান। এক্ষেত্রে নিজ নিজ পঞ্চায়েতকে জানাতে হয়। তিনি উভয় পক্ষের সাথে কথা বলেন। সেইমতো ব্যবস্থা হয়। বিচ্ছেদ স্ত্রীর সন্তান প্রথম স্বামীর

কাছেই থাকে। দ্বিতীয় স্বামী পঞ্চায়েতকে শূকর দান করেন। যা দিয়ে স্বভোজন হয়। প্রথম স্বামীকে দ্বিতীয় স্বামী সমান ক্ষতিপূরণ হিসাবে ন-টাকা প্রদান করেন। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রথম স্বামীকে দেওয়া হয় দশ টাকা। কারণ হিসাবে বলা হয় নিয়মরীতি মেনে দ্বিতীয় বিবাহে মত দিচ্ছেন সেই সম্মানে এই অর্থ দেওয়া হয়। বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 'সিঁদুর দান' পর্ব হয়। এই বিবাহে পাঁচ-দশ টাকার পরিবর্তে এক-দু টাকা প্রদানের রীতি বর্তমান।

বর্তমানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রণয়ঘটিত বিবাহে এই রীতি পালিত হয় না। অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা ডোমেদের বিশেষত পুরুষদের প্রণয়ঘটিত বিবাহ সংখ্যা নগণ্য। সামাজিক পরিকাঠামোকে এরা মান্য করেন। নিজেদের পঞ্চায়েতের অবাধ্য হন না। কারণ হিসাবে মনে করা হয় সমজের অন্যান্য জাতি যাতে তাদের উপর চাপ বা অধঃপতনে ঠেলে না দেয়।

জীবিকা ধারা

মূলত বাঁশের কাজে ডোমগণ ব্যস্ত থাকেন। এরা মূলত ভূমিহীন শ্রমিকশ্রেণি। বাঁশের কাজে যাঁরা ব্যস্ত থাকেন তাঁদের বাঁশফোড় ডোম (Bomb Spliter) বলে। চালা বা ছাতকে হিন্দিতে ছপ্পড় বলে। সেই থেকেই এই সকল ডোমেদের ছপড়িয়া ডোম বলে। যে সকল ডোম সিরকি (Sirki) নিয়ে কাজ করেন তাদের উত্তরিয় ডোম বলে। মাগাহিয়া ডোমেদের থেকে এদের জীবনযাত্রায় বেশ কিছু তফাত দেখা যায়।

আমাদের জেলায় কর্মধারা অনুযায়ী ডোমগণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যাঁরা ঘুনি, মুরকি, কাঠির চাকা, জংলি ঠাকা বানান তাদের বলা হয় **মাহালি ডোম**। যাঁরা চালা, কুলো, ঠাকা, বাঁশ দিয়ে বানান তারা **ব্যসস্থ ডোম**। যে সকল ডোম চাঁচ, ঝাঁপি (মুরগির বাচ্চাদের ঢাকার জন্য) বানানো তাদের **কুমড়ি ডোম** বলা হয়। তালপাতার খুপি, বর্ষায় ও রোদের তাল পেখ্যা, কাশ কাঠির খুপি, কলের টুকরি (যার মধ্যে ফল রপ্তানি করা হয়) বানানো যে সকল ডোম তাদের **ওড়িয়া ডোম** বলা হয়। ওড়িশা থেকে এসে বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা তাই এদের এমন নাম। তবে বাঁশ-বেত-তালপাতা-কাশফুলের কাঠি ইত্যাদির কাজ ছাড়াও মৃতদেহ আনয়ন, পোড়ানো, শব ব্যবচ্ছেদেও ডোমেদের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বর্তমানে ডোমগণ সময় উপযোগী কাজে বেশি ঝুঁকছেন। বড় বড় উৎসবে ঢাক বাজানোর সময় বড়দের সাথে কাঁসি হাতে ছোটরাও পাড়ি জমায় শহর থেকে শহরতলিতে।

ডোম মহিলাগণ সন্তান প্রসবের সময় প্রসূতিকে সহায়তা করেন। এদের দাই (Dai) বলা হয়। তবে ডোমেদের মধ্যে চামাইনস (Chamains) ডোম এই কাজ করেন না। এরা কেবল শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন।

উৎসব অনুষ্ঠান

পদবি ও জাতিকে চেনা যায়। বাঁকুড়াতে চেনা যায় প্রাণী পুজোর ধরন থেকে। যে যে প্রাণীর নামে তাদের জাতির নাম যুক্ত তারা সেইসব প্রাণীদের কখনোই হত্যা করেন না বা আঘাত করেন না। বাংলায় বিভিন্ন স্থানে ডোমেদের মধ্যে এমনি প্রাণী পুজো (Totemism) লক্ষ্যনীয়।

পূর্ববঙ্গ সহ আমাদের রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে ডোমগণের শ্রাবণীয়া পুজো হয় জুলাই-আগস্ট মাসে। এতে শূকর ছানা বলি দেওয়া হয়। বলির রক্তকে পাত্রে রাখা হয়। এক পাত্র রক্ত; একপাত্র দুধ ও একপাত্র সুরা বিহু দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। আবার ভাদ্র অমাবস্যায় এক পাত্র দুধ, চার পাত্র সুরা, একটি নারকলে, চুরুট দিয়ে হরিরাম দেবতার পুজো দেওয়া হয়। কিছু হিন্দুদের ন্যায় সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণে বাড়ির দরজায় তাম্রমুদ্রা রাখেন। অমঙ্গল থেকে দূরে থাকতে এই ব্যবস্থা করেন।

ডোম সম্প্রদায়ের দুটি বিশেষ রীতি সবাই মেনে চলেন। যে সকল ডোমগণ ঢাক বাজানোর কার্যে যুক্ত তারা সবাই চৈত্র মাসের চড়ক সংক্রান্তির পূর্ব দিন অর্থাৎ নীল পুজোর দিন ঢাক বন্ধ রাখেন। মহাদেবের চরণে আত্ম নিবেদনের প্রকাশ হিসাবে মনে করা হয়। বছরের এই একটি দিন সমগ্র ডোম জাতি এই রীতি মেনে চলেন। অপরপক্ষে যে সকল শিব মন্দিরে অক্ষয় তৃতীয়ায় কিংবা বৈশাখী চড়ক হয় সেইক্ষেত্রে চড়কের আগে নীলের দিন ওই গ্রামের তথা বহিরাগত বাজিয়াগণ ঢাক বন্ধ রাখেন। সর্বদা ঢাক বাজানোর পূর্বে ঢাককে চাল-গামছা সহ 'ঢাক মঙ্গল' করে নিতে হয়।

অপর বিশেষ অনুষ্ঠান হল 'কাতান পুজো'। বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গা পুজোর একমাস আগে ভাদ্র মাসের রাধা অষ্টমীর পূর্বে যে ষষ্ঠী আসে সেই ষষ্ঠীকে বলা হয় 'কন ষষ্ঠী' এদিন দুর্গা মায়ের পায়ে মাটি দিয়ে মূর্তি নির্মাণ শুরু হয় এই বিশেষ দিনে সকল ডোম সম্প্রদায়ের যাঁরা বাঁশের কাজে যুক্ত থাকেন তারা নিজ নিজ কর্মের যন্ত্রের বিশ্রাম দেন। কাতান-ই মূল উপাদান হওয়ায় এই অনুষ্ঠানের নাম 'কাতান পুজো'। ব্রাহ্মণ আসেন, কাতান, ভ্রমর, ধবড়া সুচ (বড় সূচ) ইত্যাদিকে রেখে হয় বিষ্ণু পুজো। অনেকটা বিশ্বকর্মা পুজোর মতো। বাড়ির সবাই, নিতান্ত পুজোতে যাঁরা যুক্ত থাকেন তাঁরা নতুন পোশাক পরেন। পুরোহিতকে উত্তরিয়-ধুতি প্রদানপূর্বক গৃহ ও কর্ম স্বচ্ছলতার জন্য হোম যজ্ঞ করা হয়। সামর্থ্য অনুযায়ী আড়ম্বর বা অনাড়ম্বরভাবে ডোম সম্প্রদায় এই অনুষ্ঠান পালন করেন।

ধর্ম ধারা

ডোমেদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মভাব লক্ষ করা যায়। বহু মিশ্রণ পদ্ধতিতে ধর্মীয় কাজ চলে। নীচু জাতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা বর্তমান। হিন্দুগণ এদের স্বকীয়তাকে বাধা দেন। আবার এমন নিম্নভাবে জীবনযাপন করেন যাতে এদের সঙ্গে হিন্দুদের মিশতেও সমস্যা হয়। তাই পরিস্কারভাবে ধর্মীয় রীতিনীতির প্রকাশ কঠিন।

ডোমেদের ভাগ্নারা (বোনের ছেলে) ও সম্পত্তির অংশ পেত। তবে বর্তমানে এই প্রথা বিলুপ্ত। অন্য হিন্দুদের মতো বড় পুত্র সম্পত্তির বেশি অংশ পেয়ে থাকেন। আঙ্কুরিয়া

জাতির কিছু কিছু ডোম ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত হিসাবে কাজে নিযুক্ত। তবে সেই পুরোহিত কেবল ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের ডোমগণ বৈষ্ণবদের প্রতি আসক্ত ধর্মীয় ব্যাপারে। রাধা-কৃষ্ণের স্থানে ওরাও ধর্মরাজ্যের পুজো দেন। ধর্ম দেবতার লেজ মাছের মতো আর মাথাটা মানুষের মতো। ভাত-চিনি (মিষ্টান্ন হিসাবে) পুজো দেন। ঝাড়গ্রামের দক্ষিণে কাশীডাঙার কামেশ্বর মন্দিরের 'কাশীডাঙার উড়া পরব' ওখানকার আদিম ভূমিপুত্র মাহাত সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম পূজিত হয়। ডোম সম্প্রদায়ই এখানের ধর্ম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সূর্য দেবতার আশীর্বাদ পেতে সূর্য পূজাও লক্ষ করা যায়।

প্রতি বছর বৈশাখ মাসে বনে যান ও ডোম সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ 'কালুবীরের' পুজো দেন। পশ্চিমাঞ্চলের ডোমগণ ভাদু দেবতার পুজো করেন। ভোজনিয়া ডোমরা দুর্গাপুজোর সময় তাঁদের ড্রাম পুজো করেন। কালীপুজোতে অনেক ডোম অংশ নেন।

দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র। তাঁর দানের পরীক্ষা নিতে বিশ্বামিত্র মুনি আসেন। সসাগরা পৃথিবীর রাজার নিকট রাজ্য ভিক্ষা চান। রাজা তৎক্ষণাৎ সেই দানে অনুমতি দেন। নিজেদের থাকবার স্থান হিসাবে মহাতীর্থ কাশীধামে যেতে বাধ্য হন। দান তো হল, ঋষিবর চান দানের দক্ষিণা। দানের দক্ষিণার জন্য নিজ স্ত্রী শৈবা, একমাত্র পুত্র রোহিতাশ্বকে বিক্রি করেন। তাতেও দক্ষিণার অর্থ সংকুলান না হওয়ায় বাধ্য হন নিজেকে বিক্রয় করতে। এক চণ্ডালের কাছে নিজেকে বিক্রয় করে দানের দক্ষিণা ঋষি পদে সমর্পণ করেন। এরপর এল সেই ভীষণ বিভীষিকা। একমাত্র পুত্র পুষ্পচয়নে গিয়ে সর্পাঘাতে মারা যান। মৃত পুত্রের দাহ কার্যে শৈবা এসে হাজির হন স্বামীর শ্মশানে। অর্থ বিনা দাহ কার্যে অসমর্থ হরিশ্চন্দ্র। নিজ ভাগ্য পরিহাসের কথা বিলাপ করে বলতে থাকেন শৈবা। বিদ্যুতের ঝলকে আর নিজের নাম ধরে আর্তনাদে যুগলের ঘটল পরিচয়। জীবন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত জীবন পুত্রের চিতাতে নিবেদনে প্রস্তুত হতে থাকেন। এই মহালগ্নে রাজা বিশ্বামিত্র আসেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের দানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর রাজ্য তাঁকেই ফিরিয়ে দিঁয়ে আবার ঋষি বিশ্বামিত্র হলেন। জগৎজোড়া এই দানের ঘটনায় হরিশ্চন্দ্র হলেন দানবীর হরিশ্চন্দ্র। রাজা যে সকল চণ্ডালদের সাথে দাহকার্যে যুক্ত ছিলেন তাদের ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি তাঁদের 'হরিশ্চন্দ্র' উপাধি প্রদান করেন। দাহ কার্যে যুক্ত ডোমেদের লোকে এখনও 'হরিশ্চণ্ডাস' বলে ডাকেন।

খাদ্যাভ্যাস

খাদ্যের উৎকর্ষ দিয়ে ডোমগণ নিজেদের সামাজিক পরিচয় দেন। যে যেমন খায় সে তেমন আর্থিক উন্নতিতে অবস্থান করে বলে মনে করে। মহিষ মাংস, ঘোড়ার মাংস, পাতিহাঁস, মেঠো ইঁদুরকেও খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। এরা সাধারণত কোনও পশুকে হত্যা করেন না। স্বাভাবিকভাবে মৃত পশুর মাংস এরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। এঁরা ধোবিদের ছোঁয়া মাংস, মিষ্টান্ত এমনকি জলও গ্রহণ করেন না। এর কারণ এঁদের মতে ধোবিরা সন্তান

জন্মানোর যেহেতু আঁতুড় ঘরের নোংরা পোশাক পরিস্কার করেন সেহেতু এঁরা নোংরা। তাই ওরা (ধোবিরা) অস্পৃশ্য ডোমেদের কাজে।

পারলৌকিক কর্মধারা :

কেউ মারা গেলে ডোমগণ পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সংবাদ জানান ও সাহায্যে আহ্বান জানান। নিজস্ব ব্রাহ্মণকে দিয়ে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ঘি-মধু-গঙ্গাজলকে উৎসর্গ করেন। এরপরে শবকে বাড়ি থেকে বাইরে বের করে রাখা হয়। এই সময় বয়সে ছোটরা (বিশেষত নাতি-নাতনিগণ) মাটির প্রদীপ বানিয়ে তাতে ঘিয়ের বাতি করে জ্বেলে স্বর্গ গমনের পথে আলোর দিশা দেখান। বাড়ির যে স্থানে শবদেহ ছিল সেখানে ঘিরে রাখা হয়। ওই স্থানে চতুর্থ দিন পর্যন্ত (চতুর্থা) একটি বাতিকে জ্বেলে রাখা হয়। পূর্বে ডোমেরা মৃতদেহকে পুড়ত না, কিংবা কবর দিত না। তারা তিব্বতের ন্যায় মৃত ব্যক্তিকে প্রথমে সবাই একসাথে সমাজচ্যুত করত। এরপর রাতে মৃতদেহকে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হত। এর পরে স্নান সেরে লোহা-পাথর-শুকনো গোবর, ভাত ও সুরাসকল সকল শ্মশান যাত্রীকে দেওয়া হত। মৃতা আত্মীয়রা নয়দিন মাছ ও মাংস খেত না। দশম দিন মাংস, সুরা চলত মাতাল না হওয়া পর্যন্ত। মৃতদেহের টুকরো নদীতে ভাসানোতে হিন্দু সম্প্রদায়গণ বাধা দেন। ফলে এই নীতির পরিবর্তন হয়। বর্তমানে হিন্দু রীতিরই প্রাধান্য বেশি লক্ষ করা যায়।

দেহকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে কাঠের চিতা সাজানা হয়। পুত্রগণ জুন ও পাট কাঠিতে আগুন দিয়ে তিনবার প্রদক্ষিণপূর্বক মুখাগ্নি করেন। হিন্দুদের ন্যায় হাঁড়ি দিয়ে পোড়ার পরে জল দেওয়াও হয়। মৃত্যুর চতুর্থ দিন পরে মৃতার উদ্দেশ্যে ভজ্জি দেওয়া হয়। অগ্নিকর্তা উত্তরিয় ধারণ করেন। পইতা ধারণ করে অশৌচ পালন পর্যন্ত। পোড়ানোর স্থানের হাঁড়িতে করে জল এনে দাহকার্যের সব ছাই একত্রিত করে মাটি সহযোগে সন্তিক মূর্তি বানানো হয়। একটি মাটির ভাঁড়ে লাগানো তুলসী গাছকে ওই অবয়বের মাথায় স্থাপন করা হয়। পরে পঞ্চ শস্য—বীরি, শ্বেত সরিষা, বাঁশ কলাই, যব ছড়িয়ে দেওয়া হয়। নতুন থান অথবা মৃত ব্যক্তির কাপড়ের টুকরোকে চাঁদোয়া করে দেওয়া হয়।

ওই দিন থেকে আগুন কর্তা বাড়ির অপেক্ষাকৃত নির্জন দিকে কোনও গাছের তলাতে অগ্নিকর্তার হাতের ৩১/২ হাত স্থান পরিষ্কার করা হয়। নিজ হাতের ২১/২ মুষ্টি চাল, ৩টি কাঁচকলা, ৩টি আলু সহযোগে নতুন হাঁড়িতে ২১/২ হালা জ্বাললে ২১/২ গণ্ডুষ জলে ফোটানো হয়। অখণ্ড কলার পাতাতে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শবের আত্মার উদ্দেশ্যে বাজিয়ে দেওয়া খাদ্যকে 'কাকবলি' বলা হয়। প্রত্যহ সেখানে ধুপ-ধুনা দেওয়া হয়। প্রতিদিন জল-খাবার, দুপুরে 'কাকবলি' ও সূর্য ডোবার আগে টিফিন দেওয়া হয়। কোনও নেশাড়ু মৃত ব্যক্তি মরলে সেই নেশার দ্রব্যও দেওয়া হয়। উল্লেখ্য আগুন কর্তাও সূর্যাস্তের পরে কিছু ভক্ষণ করেন না। চৌদ্দো দিনের দিন বাড়ির সবাই নখ ও লোম ত্যাগ

করেন। পঞ্চদশ দিনে বিষ্ণু পুজো সহ ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে শ্রাদ্ধ বাসর বসে। তবে স্থান পার্থক্যে এই রীতিরই কিছু ইতর বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সাধারণ হিন্দুগণের কেউ মারা গেলে তাঁকে ডোমেদের তৈরি বিশেষ খাটে করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হত। বর্তমানে খাট বা বাঁশের কাঠামোতে নিয়ে যাওয়ার রীতি জারি থাকলেও সেই কাঠামো বা খাট যে কেবল ডোমরাই বানান এমনটা নয়।

শেষ কথা

ডোমেদের আচরণ অসঙ্গত ধরনের। এঁদের মধ্যে সাধারণত দয়ালু ও মনুষ্যত্বের অনুভূতি অনেক কম। বেশি সময় এঁরা মাদকাসক্ত থাকেন। পুজোর বলি সহ নানান ভয়াভয় কর্ম যেমন কোনও জলাশয়ে বা আগুনে পোড়া মৃতদেহ উদ্ধার ইত্যাদি কাজে এঁদের অংশ নিতে হয়। হিন্দুরা আন্তরিকভাবে এঁদের সাথে মিশতে পারেন না, তাই সমাজজীবনের সব কথা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়নি। তবুও এঁদের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণে গিয়ে জীবনের পলে পলে যে দরিদ্র্যতা, যে যন্ত্রণা লক্ষ করেছি তা প্রকাশ কঠিন। ভেবে পাই না এমন ক্লেদময় পরিমণ্ডলে থেকেও সমাজজীবনের সুন্দর ও অবশ্যম্ভাবী কর্মে কোনও জাদুবলে আত্মনিবেদন করেন। ছন্দের জাদুকরের অপর হরিজনের নিমিত্ত লেখা কয়েকটা লাইন যেন এঁদের জন্যও ভীষণভাবে প্রযোজ্য। শেষ কথায় সেই কথাকটি বলে কলম থামালাম।

'কে বলে তোমারে, বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারই পেছনে;
*　　*　　*
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ
আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্মল।
এস বন্ধু; এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।'